বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি
ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ মহোদয়- এঁর অভিভাষণ-২০২৪

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা, ড. আসিফ নজরুল;

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ;

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি জনাব শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান;

বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান;

সুপ্রীম কোর্ট বারের বিজ্ঞ সভাপতি, সিনিয়র এডভোকেট, ব্যারিস্টার এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন;

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত জেলা আদালতসমূহে কর্মরত বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারকবৃন্দ;

সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তাবৃন্দ;

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ;

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ;

ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ;

আসসালামু আলাইকুম। শুভ সকাল।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ২০২৪ সালের গণবিপ্লবে আত্মদানকারী শহীদদের, যাঁরা জাতিকে এক নতুন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছেন। যতদিন

বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন শহীদ আবু সাঈদ, মীর মাহবুবুর রহমান মুগ্ধ, বাবার কোলে নিহত ছয় বছরের শিশু রিয়া গোপ, ওয়াসিম আকরামসহ ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদকে এদেশের মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য অকুতোভয় শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষকে। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আন্দোলনে আহত ছাত্র-জনতাকে, যাদের বীরত্ব আগ্রাসী শক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। আমি তাদের সকলের দ্রুত নিরাময় ও সুস্থতা কামনা করছি।

সুধীবৃন্দ,

বাংলাদেশের ইতিহাসের পথ পরিক্রমা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাব বাংলার ইতিহাস মূলত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ইতিহাস। বাংলার মানুষের লালিত শাশ্বত ন্যায়বোধের চেতনা বিভিন্ন সময়ে অনুরণিত হয়েছে শাসন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিরতিহীন নানা সংগ্রামে; যার চূড়ান্ত পরিণতিতে লাখো প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

রাষ্ট্রব্যবস্থার এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাকে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের জন্য যে কঠিন বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব ছাত্র-জনতার এই বিপ্লবের কারণে আমার উপর অর্পিত হয়েছে, সেই দায়িত্ব সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ আপনারা- আমার বিচার বিভাগীয় সহকর্মীগণ!

প্রিয় বিচারকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

বিগত বছরগুলোতে বিচার বিভাগের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। ন্যায় বিচারের মূল্যবোধকে বিনষ্ট ও বিকৃত করা হয়েছে। শঠতা, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও নির্যাতনের হাতিয়ার হিসাবে

বিচার বিভাগকে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে। এতে বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। অথচ বিচার বিভাগের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হচ্ছে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস। তাই নতুন এই বাংলাদেশে আমরা এমন একটি বিচার বিভাগ গড়তে চাই যেটি বিচার এবং সততা ও অধিকারবোধ এর নিশ্চয়তার একটি নিরাপদ দূর্গে পরিণত হবে। আমি আপনাদের *Fiat justitia, ruat caelum* এই প্রবাদটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যার অর্থ হলো- "Let justice be done, though the heavens fall।" আমাদের সামনে এখন যে বাধাগুলো রয়েছে সেগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়েই আমাদের নতুন ভোরের শপথ নিতে হবে এবং নতুন যাত্রার সূচনা করতে হবে।

যে ন্যায়ের আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করে লক্ষ জনতা এ দেশ স্বাধীন করেছিল তা বাস্তবায়নের জন্য অপশাসন রুখে দিয়ে নতুন দেশ ও জাতি গঠনের গুরু দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পণ করেছে বিপ্লবী ছাত্র-জনতা। এই লক্ষ্যে আমাদের এখন জনউত্তাপের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাবতে হবে যে কেন বিচার বিভাগের এই ছন্দপতন হয়েছিল। কী কী বিষয় এর জন্য দায়ী। এই পথে কী কী প্রতিবন্ধকতা আছে, সেগুলো আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। তারপর আমাদের কাছে কী কী জনসম্পদ ও অবকাঠামোগত সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে তা নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে এবং এই জাতীয় দুর্বিপাক থেকে উত্তরণপূর্বক একটি জনমুখী আইন ব্যবস্থা ও বিচার কাঠামো বির্নিমাণে করণীয় সম্পর্কে একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ (Roadmap) প্রস্তুত করতে হবে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ কার্যকররূপে পৃথক না হওয়া। এর কুফল আমরা সবাই ভোগ করেছিলাম গত দেড় দশক ধরে। এছাড়াও আছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, মামলা অনুপাতে বিচারকের নিদারুণ স্বল্পতা, বার ও বেঞ্চের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবের ঘাটতি, আদালতগুলোর অবকাঠামোগত সংকট, অধস্তন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য নীতিমালা না থাকা, উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ, স্থায়ীকরণ ও উন্নীতকরণের

ক্ষেত্রে কোন আইন না থাকা ও প্রথাগত জ্যেষ্ঠতার নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলো; যা আমাদের বার বার পিছিয়ে দিয়েছে।

একটি ন্যায়ভিত্তিক বিচারব্যবস্থার কাজ হলো নিরপেক্ষভাবে, স্বল্প সময় ও খরচে বিরোধের মীমাংসা নিশ্চিত করে জনগণ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দেওয়া। এ জন্য বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ ও আইনসভা থেকে পৃথক ও স্বাধীন করা সবচেয়ে জরুরি। কেননা শাসকের আইন নয়, বরং আইনের শাসন নিশ্চিত করাই বিচার বিভাগের মূল দায়িত্ব।

বিচার বিভাগ যেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য আমি জরুরি ভিত্তিতে বিচার বিভাগে কিছু সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতা কামনা করছি। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হবে বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের যে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে তা দ্রুত দূর করে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী, আধুনিক, দক্ষ ও প্রগতিশীল বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা।

সুধীবৃন্দ,

বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে মাসদার হোসেন মামলার রায়ের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন একান্ত আবশ্যক। বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৬ক অনুচ্ছেদে অধস্তন আদালতের বিচারকগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন মর্মে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বিচারকদের প্রকৃত স্বাধীনতা ততদিন পর্যন্ত নিশ্চিত হবে না; যতদিন না বিচার বিভাগে দীর্ঘ দিন ধরে বিরাজমান দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা, অর্থাৎ, সুপ্রীম কোর্ট ও আইন মন্ত্রণালয়ের যৌথ এখতিয়ার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অধীনে পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এটি হবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রথম ধাপ। সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর

হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এই অনুচ্ছেদের বুনিয়াদে সংবিধানের কোনো সংশোধন না করেই শুধুমাত্র রুলস অফ বিজনেস (Rules of Business) এবং বিচারকদের নিয়োগ, কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, বরখাস্তকরণ, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদি সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত যে সকল বিধিমালা প্রচলিত রয়েছে সেগুলোতে প্রদত্ত "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সেখানে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় এর সচিব কে অন্তর্ভুক্ত করলেই সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় তথা বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পথে আইনগত কোনো বাধা থাকবে না।

এছাড়াও জেলা আদালতসমূহের বাজেট বরাদ্দের বিষয়টিও তখন বিচার বিভাগীয় সচিবালয় হতেই নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয় এর ন্যায় বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তাব প্রস্তুতক্রমে আমরা শীঘ্রই আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবো। উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আইন উপদেষ্টার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই Plan of Action- এ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিতকরণে UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary- তে বর্ণিত বিধানসমূহকে অনুসরণীয় Best practice guideline হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, বর্তমান সময়ই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের শ্রেষ্ঠ সময়।

প্রিয় বিচারকবৃন্দ,

বিচার বিভাগীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠার পর বিচার বিভাগে গুণগত পরিবর্তন আনয়নে আমার অন্যতম কাজ হবে বিচারকগণের যোগ্যতার ভিত্তিতে পদায়ন নিশ্চিত করা। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে কর্মরত বিচারকদের মধ্য থেকে সৎ, দক্ষ, স্বাধীন মনোভাব ও নেতৃত্বদানের গুণাবলী সম্পন্ন উপযুক্ত বিচারকদের নিয়ে প্যানেল বা ফিট লিস্ট (Fit list) তৈরি করে সে প্যানেল

থেকে প্রতিষ্ঠান প্রধান, যেমন- জেলা জজ, দায়রা জজ, সিজেএম, সিএমএম পদে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা আমি নিশ্চিত করব, যেন বিচার বিভাগ পূর্বের শাসনামলের ন্যায় ভীতু ও আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে না পারে। বর্তমানে বিচারকগণের পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো ঘোষিত নীতিমালা নেই। ফলে পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই বিচারকগণ বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। আমি এ বিষয়ে একটি যথোপযুক্ত নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করবো।

সুধীমণ্ডলী,

শুধু বিচার বিভাগীয় পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে সংবিধানের ৯৫(২) অনুচ্ছেদে যে বিধান রয়েছে কেবল সেটুকু নিশ্চিত করে বিচারক নিয়োগের ফলে সুপ্রীম কোর্টে এক অভূতপূর্ব অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসেবে পালন করেছে। এটি ন্যায় বিচারের ধারণার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। যুক্তরাজ্যের সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের জন্য স্বাধীন Judicial Appointments Commission রয়েছে। Constitutional Reform Act 2005 ও The Supreme Court (Judicial Appointments) Regulations 2013 অনুসারে যোগ্য ব্যক্তিদের নিকট হতে এই কমিশন দরখাস্ত আহ্বান এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে বিচারক হিসেবে মনোনীত করে। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সংবিধানেও উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগের কোন সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা না থাকার প্রেক্ষিতে সে দেশের উচ্চ আদালত বিচারিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে ১৯৯৩ সাল হতে কলেজিয়াম (Collegium) পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটিয়েছে।

তাই উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে অন্যান্য দেশসমূহে অনুসৃত আধুনিক পদ্ধতিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে আমাদের দেশে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে একটি কলেজিয়াম

(Collegium) ব্যবস্থা চালু করতে আমি সচেষ্ট হবো। আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি যে এই প্রচেষ্টায় আমি আপনাদের সকলকে আমার পাশে পাবো।

প্রিয় বিচারকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

স্বাধীন বিচার বিভাগের অন্যতম শর্ত হচ্ছে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ। এ উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের অধীনে জেলা আদালতসমূহের জন্য সরকারকে স্বতন্ত্র বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। সুপ্রীম কোর্ট বিচার বিভাগের উন্নয়ন ও পরিচালন বাবদ যে বাজেট চাইবে সরকারকে তা প্রদান করতে হবে।

মাসদার হোসেন মামলায় প্রদত্ত ১২ দফা নির্দেশনার মধ্যে ৬ নং দফায় জুডিসিয়াল পে কমিশন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সেই নির্দেশনার আলোকে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (পে কমিশন) বিধিমালা ২০০৭ প্রণীত হয়েছে। উক্ত বিধিমালার ৪ (৩) বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পে কমিশন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং অন্য সার্ভিসের বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সার্ভিসের সদস্যদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন এবং উহা সরকারের নিকট পেশ করবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশনার আলোকে এ পর্যন্ত মাত্র দু'বার জুডিসিয়াল সার্ভিস পে কমিশন গঠিত হয়েছিল। আরো দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে উভয় পে কমিশনের প্রতিবেদনে মাসদার হোসেন মামলার ৬ নম্বর দফার নির্দেশনার শেষ লাইন, "The pay etc of the judicial service shall follow the recommendations of the Commission." উদ্ধৃত করে উল্লেখ করা হয়েছে যে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অথচ এরপরেও কমিশনের সুপারিশ সরকার পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করেনি। যেমন- ২য় পে কমিশনের প্রতিবেদনের ৭.১ অনুচ্ছেদে জুডিসিয়াল সার্ভিসের সকল পর্যায়ের সদস্যদের মাসিক মূল বেতনের ৩০% সমপরিমাণ হারে জুডিসিয়াল ভাতা প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছিল। ২০১৬ সালের বেতন

ভাতাদি আদেশে সরকার ৩০% জুডিসিয়াল ভাতার বিধান রেখেছে, তবে সেটা ২০০৯ সালের স্কেলের ওপর, যা পে কমিশনের সুপারিশের সুস্পষ্ট লংঘন।

সুধীবৃন্দ,

বিচার বিভাগের অর্থপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আদালত ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সহায়ক কর্মকর্তা ও কর্মচারির পদ সৃজনে সুপ্রীম কোর্টের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে সরকার তথা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা যৌক্তিক কারণেই থাকবে, তবে তারা কেউ পদসৃজনে অযৌক্তিক আপত্তি প্রদান করতে পারবে না। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে আইন মন্ত্রণালয় থেকে বিচারকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ বিভিন্নভাবে আদালত ও পদ সৃষ্টির কাজে অযৌক্তিক বাধা প্রদান করেছে। এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। অন্যদিকে, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার জন্য জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যেন তাদের নিয়োগ প্রদান করা যায় সে জন্য প্রচলিত আইন ও বিধি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। তাদের ব্লক পদ বিলুপ্ত করে যুগোপযোগী পদ সৃজনপূর্বক যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির সুযোগ রেখে অভিন্ন নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করতে হবে। এ বিষয়ে মাননীয় আইন উপদেষ্টা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন মর্মে আমি আশাবাদী।

সুধীমণ্ডলী,

বিচারকগণ যে গুরু দায়িত্ব পালন করেন তা রাষ্ট্র কাঠামোর ভিত্তি মজবুত করতে সহায়তা করে। আমাদের বুঝতে হবে যে একজন সহকারী জজের আদেশও প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী মানতে বাধ্য, কেননা বিচারকগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌম বিচারিক ক্ষমতার প্রয়োগ করে থাকেন। মাসদার হোসেন মামলার রায়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মোস্তফা কামাল

আমাদের দেশের অধস্তন আদালতের বিচারকদের মর্যাদা ও তাদের পেশাগত অবস্থান স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য ভারতের সুপ্রীম কোর্টের একটি রায়ের অবতারণা করেন এভাবে-

The status given to them under our Constitution is not very different from that given by the Indian Constitution to the Indian subordinate-judiciary and it will be profitable to quote a passage from a decision of the Indian Supreme Court in All India Judges Association and others vs. Union of India and others, as follows:

> “The judicial service is not service in the sense of "employment". The Judges are not employees. As members of the judiciary, they exercise the sovereign judicial power of the State. They are holders of public offices in the same way as the members of the council of ministers and the members of the legislature. When it is said that in a democracy such as ours the executive, the legislature and the judiciary constitute the three pillars of the State, what is intended to be conveyed is that the three essential functions of the State are entrusted to the three organs of the State and each one of them in turn represents the authority of the State. However, those who exercise the state power are the Ministers, the Legislators and the Judges and not the members of their staff who implement or assist in implementing their decisions. The council of ministers or the political executive is different from the secretarial staff or the administrative executive which carries out the decisions of the

political executive. Similarly, the Legislators are different from the legislative staff. So also the Judges from the judicial staff. The parity is between the political executive, the Legislators and the Judges and not between the Judges and the administrative executive. The Judges, at whatever level they may be, represent the State and its authority unlike the administrative executive or the members of the other services. The Members of the other services, therefore, cannot be placed on a par with the members of the judiciary, either constitutionally or functionally. Therefore, while determining the service condition of the members of judiciary, a distinction can be made between them and the members of the other services."

এ কথাগুলো যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাই বিচারকগণকে যদি প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর তুলনায় যথাযথ মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া হয়, তা এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করে। বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার নিম্নে কোন বিচারকের জন্য পৃথক গাড়ি নেই। এমনকি উক্ত পদের সকল বিচারকের জন্যও গাড়ি বরাদ্দ নেই। উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত চৌকি আদালতের বিচারকদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাদের সরকারি বাহন, বাসস্থান, নিরাপত্তা- কোনোটিই নেই। মাঠ পর্যায়ে বিচার বিভাগের কার্যকর পৃথকীকরণ নিশ্চিতকল্পে বিচারকগণের পৃথক আবাসন, পরিবহন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি এবং আমি এই বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সমাধান করার জন্য মাননীয় আইন উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন, বর্তমানে অনেক জেলায় বিচারকদের চেম্বার ও এজলাস শেয়ার করতে হয়। ফলে বিচারিক কর্ম ঘণ্টার পূর্ণ ব্যবহার করতে না পারায় নিষ্পত্তি সংখ্যা কমে যায়। তাই বিচারকদের বিদ্যমান এজলাস ও চেম্বার সঙ্কট নিরসনে যে সব জেলায় এখনও সিজেএম বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়নি, সে সব জেলায় দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান, মেট্রোপলিটন এলাকায় পৃথক সিএমএম ও মহানগর দায়রা জজ আদালত ভবন নির্মাণ এবং উপজেলা পর্যায়ে চৌকি আদালতের ভবন নির্মাণ ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়ার জন্য আমি সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

প্রিয় বিচারকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

মামলাজট বিচার বিভাগের একটি বড় সমস্যা হিসেবে সব আমলেই চিহ্নিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৪২ লাখ মামলা বিচার নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষমান আছে। মামলাজট নিয়ে সুধীমহলে অনেক ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু এটি মুদ্রার একটি পিঠ। মুদ্রার অন্য পিঠটা কখনো খুব বেশি আলোচনায় আসে না। মুদ্রার অন্য পিঠে আছে স্বল্প সংখ্যক লোকবল, এজলাস সংকট তথা অবকাঠামোগত অসুবিধাসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা। কিন্তু এর মধ্যেও মাত্র ২০০০ বিচারক কর্তৃক এক বছরে গড়ে ১০ (দশ) লাখের বেশি মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। এই সংখ্যা প্রমাণ করে মামলাজটের কারণ বিচার বিভাগ বা বিচারকগণ নন। বরং মামলা জটের অন্যতম কারণ হচ্ছে মামলার তুলনায় বিচারকের সংখ্যার অপ্রতুলতা। বর্তমান বাস্তবতায় বিচার বিভাগকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হলে সমগ্র বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো বা অর্গানোগ্রাম সংস্কার করে দেশের জনসংখ্যা ও মামলার সংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, বর্তমানে যে প্র্যাকটিস রয়েছে যে একজন বিচারক একই সাথে একাধিক কোর্ট এবং ট্রাইব্যুনালের দায়িত্বে থাকেন, তা বিলোপ করে একজন বিচারককে একটি কোর্টের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। এজন্য আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে। এছাড়া, দেওয়ানী ও ফৌজদারী এখতিয়ার অনুসারে

পৃথক আদালত স্থাপন করা প্রয়োজন। যুগ্ম জেলা জজ হতে জেলা জজ পর্যন্ত আদালতে এই সংস্কার আনতে হবে। এসব কিছুর জন্য সিভিল কোর্টস এ্যাক্ট (The Civil Courts Act)- এ পরিবর্তন আনতে হবে। সংস্কার প্রক্রিয়ার শুরুতে এখন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমেও এটা করা সম্ভব। এসব বিষয়ে আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি।

এসব সংস্কারের পাশাপাশি সহকারী জজ ও সিনিয়র সহকারী জজদের জন্য দ্রুত স্টেনো টাইপিস্ট/ স্টেনোগ্রাফার পদে দক্ষ জনবল নিয়োগ এবং যে সকল যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ কোর্টে স্টাফ/স্টেনো টাইপিস্ট/ স্টেনোগ্রাফার নেই, সে সকল কোর্টে দ্রুত জনবল নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্ত আমি মাননীয় উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সুধীমন্ডলী,

মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা বিচারপ্রার্থীদের দীর্ঘশ্বাসের কারণ। বিচার ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যেন বিচারপ্রার্থীদের সময় ও খরচ উল্লেখযোগ্য হারে কমে এবং আদালত প্রাঙ্গণে তাদের বার বার না আসতে হয়। তবে এই বিষয়টি বিচারকের একার উপর নির্ভর করে না। এজন্য বারের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আইনজীবীদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে হবে। একটি সমৃদ্ধ বার সমৃদ্ধ বিচার ব্যবস্থা তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এখানে বার কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান, বাংলাদেশের বিজ্ঞ অ্যাটর্নি-জেনারেল উপস্থিত আছেন। আমি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অন্যদিকে ফৌজদারি মামলার তদন্ত কাজ যেন দীর্ঘ দিন ঝুলে না থাকে, পুলিশকে সে ব্যাপারে আন্তরিক হতে হবে। আমরা দেখেছি চাঞ্চল্যকর সাগর-রুনী হত্যাকান্ডের তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ১১১ বার সময় নেয়া হয়েছে। এটা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। তদন্ত

কাজেই যদি একাধিক বছর সময় লেগে যায়, সে মামলার বিচারকাজ পরিচালনা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা সময়ের আবর্তে মামলার অনেক সাক্ষী ও সাক্ষ্য হারিয়ে যায়।

এর পাশাপাশি, আরেকটি বিষয়ে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিচার কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিচারের গতি ও মানকে অনেক উন্নত করতে পারে। সরকারের অন্যান্য অনেক বিভাগে ইতোমধ্যে দাপ্তরিক কাজকর্ম ডিজিটাল (Digital) পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের পিছিয়ে থাকা সমীচীন নয়। বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজড করার জন্য দ্রুত ই-জুডিসিয়ারি (e-judiciary) প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা সেই ২০১৫ সাল হতে ই-জুডিসিয়ারি (e-judiciary) প্রকল্পের কথা শুনে আসছি। কিন্তু এ বিষয়ে নিয়মিত বিরতিতে কিছু আমলাতান্ত্রিক আশ্বাস প্রদান ব্যতিরেকে ই-জুডিসিয়ারি (e-judiciary) বাস্তবায়নে কোনো আন্তরিক প্রচেষ্টা বা কার্যকর উদ্যোগ কখনোই দৃশ্যমান হয়নি। ২০২৪ সালের জুন মাসের মধ্যে দেশের দেড় হাজার এজলাসকে ডিজিটাল (Digital) এজলাসে রূপান্তরিত করার কথা ছিলো। আজ অবধি তা বাস্তবায়ন হয়নি। বিশেষ করে, সাক্ষ্য আইন সংশোধনের পরে বর্তমানে অডিও-ভিজ্যুয়াল (audio-visual) সাক্ষ্য-গ্রহণে আর কোন আইনগত বাধা নেই। কিন্তু ই-জুডিসিয়ারি (e-judiciary) প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে দেশের বিচার ব্যবস্থায় ভার্চুয়াল (virtual) পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

সুধীবৃন্দ,

Alternative Dispute Resolution (ADR) পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০৩ সালে দেওয়ানি কার্যবিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছিলো। এছাড়া, সারা দেশের লিগ্যাল এইড (Legal Aid) অফিসারগণ প্রি-কেস (Pre-case) ও পোস্ট-কেস (Post-case) মেডিয়েশন (Mediation) এর মাধ্যমে অনেক বিরোধ নিষ্পত্তি করছেন। এছাড়া,

লিগ্যাল এইড অফিসারগণের কার্যক্রমকে বিচারিক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। জেলা আদালতের ন্যায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টেও লিগ্যাল এইড অফিস রয়েছে। কিন্তু জেলা আদালতের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান এখতিয়ার থাকলেও লিগ্যাল এইড অফিসসমূহের উপর সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস (Supreme Court Legal Aid Office) বা হাইকোর্টের কার্যকর কোনো তত্ত্বাবধান নেই। লিগ্যাল এইড অফিসসমূহকে সুপ্রীম কোর্টের আওতাধীন করে প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধনী আনা হলে লিগ্যাল এইড কার্যক্রম আরও গতিশীলতা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

সম্প্রতি দেশের আদালতসমূহে উপস্থিত আসামি পক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকার বিষয়টি আমার দৃষ্টিগোচর হলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হতে এ বিষয়ে আমি একটি সার্কুলার (Circular) জারি করার নির্দেশ প্রদান করি। উক্ত সার্কুলারে আদালতে উপস্থিত আসামির পক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকলে লিগ্যাল এইডের আইনজীবী প্যানেল থেকে আইনজীবী নিয়োগের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ অনুসারে এতদিন কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অসঙ্গতিকে বিবেচনা করে, অর্থাৎ Means Test প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র ব্যক্তির অনুকূলে লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবী নিযুক্ত করা হতো। কিন্তু বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উক্ত সার্কুলারে আদালতে উপস্থিত আসামীর পক্ষে কোনো আইনজীবী না থাকলে লিগ্যাল এইডের প্যানেল আইনজীবী নিযুক্তির ক্ষেত্রে Means Test এর পাশাপাশি Capacity Test প্রয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা হতে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিশেষ কোনো পরিস্থিতির কারণে কোনো আসামি আইনজীবী নিযুক্ত করতে না পারলে দেশের লিগ্যাল এইড অফিসসমূহকে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশ প্রদান করেছে। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমি মাননীয় আইন উপদেষ্টাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় বিচারকবৃন্দ,

Meritrocracy বিচার বিভাগের বুনিয়াদ এবং সেই সূত্রে বিচারকাজের সাথে রয়েছে জ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক। তাই বিচারকদের সামনে সব সময়ই উচ্চতর প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ অবারিত থাকা উচিত। এই ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নে স্বতন্ত্র ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন করে এন্ট্রি পদে নিয়োগের সাথে সাথে কমপক্ষে ০৬ মাস বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, কর্মরত অন্যান্য বিচারকদের জন্য প্রতি ০২ (দুই) বছরে কমপক্ষে ০১ (এক) বার রিফ্রেশার কোর্স (Refresher Course) আয়োজন করা, নতুন কোন আইন ও উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তের প্রয়োগের পূর্বে সেমিনার, ওয়ার্কশপ আয়োজন এবং দেশে-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। এসব বিষয়ে আমি সব সময়েই সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি এবং এ ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছি। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে কক্সবাজারে সুপ্রীম কোর্ট রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট (Supreme Court Research and Training Institute) প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান আছে। সরকারের কাছ থেকে বাজেট পাওয়া সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ন্যায় বিচারকদেরও উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণের জন্য "প্রধান বিচারপতি ফেলোশিপ" চালুর ইচ্ছাও আমার রয়েছে। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস- এ যে Talent Pull ও Meritrocracy এর সূচনা ঘটেছে, এই ফেলোশিপ হবে তারই স্বীকৃতি স্বরূপ।

প্রিয় বিচারকবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

এখন একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক। বিচারকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং বিচার বিভাগে দুর্নীতি বন্ধ করতে আমি বদ্ধপরিকর। আজ আমি এই মঞ্চ হতে বিচার বিভাগে যে কোনো প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স (Zero Tolerance) ঘোষণা করছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি পর্যায়ে একজন বিচারকের দুর্নীতি সমগ্র বিচার বিভাগের উপরেই কালিমা লেপন

করে। এমনকি আদালতের একজন সহায়ক কর্মচারী কিংবা আইনজীবী সহকারীও যদি দুর্নীতি করেন, সাধারণ জনগণ সাদা চোখে সেটিকে বিচার বিভাগের অবক্ষয় হিসেবেই গণ্য করে। তাই বিচারাঙ্গন হতে যেকোনো প্রকার দুর্নীতি বিলোপ করতে হবে। যদি দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রধান, তথা জেলা জজ, কিংবা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক ব্যর্থ হন তবে সেটি-কে তার পেশাগত অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার বা কর্মচারির বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, আমাদের উচ্চ আদালত সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম এর অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক সময়েই সুপ্রীম কোর্টের এফিডেভিট (Affidavit) শাখা, Dispatch শাখা, নকল শাখার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নেতিবাচক খবর আমার কানে আসে। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই, এ ধরণের কোনো অনিয়ম আর বরদাস্ত করা হবে না। ইতোমধ্যে আমি সুপ্রীম কোর্টে উন্নত সেবা প্রদান ও অনিয়ম দূরীকরণে ১২ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছি, যার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠোরভাবে মনিটর করা হবে।

সুধীবৃন্দ, বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা দৃঢ়করণসহ আমাদের দেশের সকল পর্যায়ের বিচারকগণের পেশাগত কাজে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতা নিশ্চিতকরণে The Bangalore Principles of Judicial Conduct এ বিধৃত সকল Values and Principles এর বাস্তবায়ন আমরা নিশ্চিত করতে চাই। আমাদের মনে রাখতে হবে, এ বিষয়গুলো একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে বাস্তবায়িত হতে হতে এক পর্যায়ে সামষ্টিক প্রাকটিসে (Practice) পরিণত হয়। সদ্য প্রকাশিত এক নিবন্ধে Bangalore Principles এর সারমর্ম আমি এই ভাবে তুলে ধরেছিঃ

> The Bangalore Principles addressed to the judiciary aim at securing three primary objectives; [I] Providing a framework for ethical judicial conduct; [II] Assisting the executive, the legislature, lawyers, and the public in better understanding and

aiding the judiciary; and [III] Ensuring judges accountability to independent and impartial institutions. Predicated on these objectives the core values of the judiciary being independence, impartiality, integrity, propriety, equality, and competence and diligence emerge as the six core Bangalore Principles supplemented by extensive implementation mechanisms.

আমাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের করের টাকায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এবং জনগণই রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস। বিচার বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট ideology দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে আইন অনুসারে জনগণের নিজেদের মধ্যকার বিরোধ এবং জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করা অথবা রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা। বিচারিক এই প্রক্রিয়ায় বিচারক দেশের প্রচলিত আইন ও শুধু মাত্র নিজের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। কোনো প্রলোভন বা পেশিশক্তির কাছে বিচারক কখনো মাথা নত করতে পারেন না। এটাই যে সর্বজন স্বীকৃত বিচার বিভাগের কর্মের মানদণ্ড তা UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary দ্বারা প্রদত্ত Judicial Independence এর সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। সেই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যেঃ

The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিচার বিভাগে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের নিমিত্ত আপীল বিভাগের সাবেক বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমানকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করেছে। আমি

এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি, উক্ত কমিশন আমার ঘোষিত রোডম্যাপ (Roadmap) পর্যালোচনাপূর্বক বিচার বিভাগের সার্বিক উন্নয়ন ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সমষ্টিগতভাবে একটি Plan of Action হাতে নিতে হবে যেখানে উপরে উল্লিখিত জাতিসংঘ ও বিশেষভাবে তৈরি করা মানদণ্ড ছাড়াও অন্যান্য নীতিমালা পর্যালোচনা করতে হবে। যার মধ্যে The Commonwealth (Latimer House) Principles on the Three Branches of Government , 2003 এবং The 1998 Latimer House Guidelines for The Commonwealth on Parliamentary Supremacy and Judicial Independence অন্যতম।

এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমাকে শোনার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

মাননীয় আইন উপদেষ্টা মহোদয় শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই ছুটির দিনে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

একইভাবে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি মহোদয়গণ তাঁদের অবকাশকালীন ছুটির মধ্যে নিজস্ব কাজ বাদ দিয়ে আজকের এই অভিভাষণে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান এর উপস্থিতি আজকের অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, আমাদের করেছে অনুপ্রাণিত।

বাংলাদেশের বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল, আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য ধন্যবাদ।

সুপ্রীম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ দিন-রাত পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন- তাদেরকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জেলা আদালতসমূহে কর্মরত আমার প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আপনারা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বাস করি আপনারা আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে বিচার বিভাগের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবেন, মানুষের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন।

আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।